সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নজরুলের বোঝাপড়া এবং বাংলাদেশের সম্প্রদায়-সংকট

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ : বাংলা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা বলতে সাধারণত হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধকে বোঝানো হয়। নজরুলও প্রধানত তা-ই বুঝতেন। তিনি কাজ করেছেন এই সংকটের তীব্রতার কালে। তাঁর রচনায় হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির যে পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে, তার তুল্য কিছু বাংলা সাহিত্যে আগে বা পরে ঘটেনি। সঙ্গত কারণেই নজরুলকে এ অঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রধান প্রতীক ভাবা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, নিজের জীবন ও সাহিত্যে নজরুল অসাম্প্রদায়িক চর্চাকে সুউচ্চ মহিমা দিতে পারলেও তাঁর এ-সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়নি। তাঁর হিন্দু-মুসলমান মিলন-আকাঙ্ক্ষা ছিল জাতীয়তাবাদী ঘরানার, যেখানে জাতি বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান যৌথ তৎপরতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। ফলে এ যৌথতা মুখ্যত তাঁর শুভকামনা মাত্র। সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তিনি কোনো কাঠামোগত বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। সমস্যার ঐতিহাসিক কুলজিও সন্ধান করেননি। এ কারণেই বাংলাদেশের বর্তমান সম্প্রদায়-সংকট বুঝতে ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে নজরুল-রচনাবলি আমাদের খুব কমই সাহায্য করে।

১

ভারতীয় উপমহাদেশের সম্প্রদায়-সমস্যা অতি পুরোনো। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেও এ সংকট তীব্র ছিল, তবে তীব্রতর হয়েছে হিন্দু-মুসলমান আমলে। বহু-বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর এ অঞ্চলে সম্প্রদায়ের ধারণা এবং সম্প্রদায়-সংকট আসলে অতি বিচিত্র এবং অতি জটিল। জাতপাত-বর্ণের সমস্যা আছে, অনার্য-আর্য সংঘাতের বহু ধরন ও স্তর আছে, আছে ভাষাগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংঘাত। কিন্তু মূলত গত একশ বছরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকেই বোঝানো হয়। এই সর্ববিস্তারী ধারণা ও বোধ গভীরভাবে ক্ষতিকর।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.4

এতে একদিকে বহুবিস্তৃত এবং বিচিত্র একটা সমস্যাকে সংকীর্ণ করে দেখা হয়, অন্যদিকে খোদ হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রকৃতি বুঝতেও সমস্যা হয়। কারণ, যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমস্যার নামায়ন হয়েছে বা প্রধান কারণগুলো সাব্যস্ত হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আর বিদ্যমান নাই। অথচ সমস্যাটা গভীরভাবেই আছে – অন্য রূপে আছে। এ সমস্যাকে বলা যায় পরিভাষাজনিত সমস্যা। পরিভাষা নির্ধারিত হয়েছে এক বাস্তবতায়। সে বাস্তবতা সম্পূর্ণত না হলেও বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতা ব্যাখ্যা করার জন্য একই পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের (১৯৪৭) আগের বাংলা অঞ্চলের সম্প্রদায়গত পরিস্থিতি অবশ্য হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও বিরোধের সাপেক্ষে শ্রেষ্ঠাংশে ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ এই বিরোধ তখন বিশেষভাবে বিধ্বংসী রূপ নিয়েছিল। ১৯২৬-৪৬ সাল ছিল এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্রতার কাল। ১৯৪৭ সালের দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের পেছনেও হিন্দু-মুসলমান বিভাজন ঘোষিতভাবেই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। এর আগে – অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের যৌথতার কালে – রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর একাংশ যৌথ তৎপরতায় শামিল হয়েছিল। নজরুলের সক্রিয়তার তীব্রতম কালে এই দুই ঘটনা ঘটেছিল – সাময়িক মিলন এবং পরে বিধ্বংসী বিচ্ছেদ। ফলে এটা মোটেই কাকতালীয় নয় যে, নজরুলের রচনায় সম্প্রদায়-সম্প্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ গভীরভাবে কাজ করে গেছে; এবং একইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ব্যাপারে সবচেয়ে জোরালো হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে।

২

হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির উপস্থাপনা এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশের দিক থেকে নজরুল-সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যধারার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক বিচারে এ ঘটনার গুরুত্ব বোঝার জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের খবর নেয়া দরকার। মধ্যযুগের কয়েকশ বছরের সামবায়িক সাধনায় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহ্য প্রকাশের কার্যকর ধারা তৈরি হয়েছিল। তাতে দুই পক্ষের সাহিত্যিকদের – সমপর্যায়ের না হলেও – অংশগ্রহণ ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যাক, বটতলার সাহিত্যে এক ধরনের যৌথ ভাষা এবং যৌথ জনসংস্কৃতির প্রতিফলন পাওয়া যায়। যাকে ব্যাপকভাবে পরে 'দোভাষী পুথি' বা 'মুসলমানি বাংলা' বলা হয়েছে, পুরো উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সেই ভাষার রচনা বিপুল পরিমাণে রচিত ও পঠিত হয়েছে। *গোলে বকাওলি*, *ইছফ জোলেখা*, *লায়লি মজনু*, *সাহানামা* প্রভৃতি জনপ্রিয় বইয়ের অনুবাদক, প্রকাশক আর ভোক্তার তালিকায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রচুর (গৌতম ২০১১ : ২২৫-৩০; সুমন্ত ২০১১ : ১১৮)। ইংরেজ আমলে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন

সাহিত্যচর্চার কালে ওই পুরোনো ঐক্যের ধারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *হ্যাবিটেশন অব মডার্নিটি* বইয়ের অন্তর্গত 'মেমরিজ অব ডিসপ্লেসমেন্ট: দ্য পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রেজুডিস অব ডুয়েলিং' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন (Chakrabarty 2002), বাঙালি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তাঁবে গড়ে-ওঠা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে 'ঘরের কথা' লেখা হল, তাতে মুসলমান সমাজ পুরোপুরি বাদ পড়ল। 'বাদ পড়া' বলতে কী বোঝায়, দীপেশ চক্রবর্তী তার গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। সুদীপ্ত কবিরাজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে সারগর্ভ দীর্ঘ নিবন্ধে লিখেছেন:

> In the age of Rammohan Roy (1774–1833), cultivation of an upper-class Bengali included a mandatory initiation into Islamic culture and a fluent grasp of Persian. By the time of Rabindranath Tagore (1861–1941), roughly a century later, literary high culture had gone through a striking conversion to become a more solidly Hindu sphere. (Kaviraj 2003: 531)

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নজরুল পালন করেন বিপ্লবী ভূমিকা। তিনি আগের প্রায় একশ বছরে কলকাতায় 'জমে ওঠা' সাহিত্যিক ভাষা নিঃসংশয়ে ব্যবহার করলেন, একই সাথে মুসলমান সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অকুণ্ঠিত সামর্থ্যে মূলধারার সাহিত্যে নিয়ে এলেন। আহমদ ছফা নজরুলের এই তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের সারসংক্ষেপ করেছেন এভাবে:

> নজরুলের কাছে বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের 'ভাষাহীন' পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্যসৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালি সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে নব বিকাশধারায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে অনেকদূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মাণ করেছিলেন। (আহমদ ছফা ২০০২ : ১৩১)

নজরুলের ক্ষেত্রে এই ভাষিক যৌথতা কোনো আলগা উপাদান ছিল না, কিংবা অলংকারবিশেষ ছিল না। এ ছিল তাঁর শৈল্পিক-নান্দনিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তৎসমবহুল বাংলার গাম্ভীর্য, ধ্বনিগৌরব আর নৃত্যপরতা তাঁর কবিভাষার অন্যতম প্রধান সম্পদ। তাঁর কাব্যকলার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নায়ক শিব – শিবের তাণ্ডবনৃত্যের ইমেজ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কবিতার একাংশের প্রধান নান্দনিক প্রেরণা। অন্যদিকে দোভাষী পুঁথি এবং হিন্দুস্থানি ভাষার নৈকট্যে সমৃদ্ধ মুসলমান সমাজের ভাষার একটা জনগ্রাহ্য রূপও তাঁর কবিতার গুরুত্বপূর্ণ একাংশের ভিত্তি তৈরি করেছে। তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনবোধ বিশেষভাবে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব-প্রভাবিত (আহমদ শরীফ ১৩৭৯)। ইসলামি বিশ্বাসব্যবস্থা, আচার ও ঐতিহ্যের কাব্যিক ইমেজ নিপুণ সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে নজরুল কাব্যে।

বলার কথা হলো, হিন্দু-মুসলমান ভাষা ও সংস্কৃতির যৌথতা নজরুল-সাহিত্যের অন্তরঙ্গ উপাদান। আরো দুটি উদাহরণ থেকে কথাটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। 'সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৩৭৯ : একষট্টি)। একজন কবির পক্ষে এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন জীবনযাপন ও সার্বিক উপলব্ধির 'অচেতন-অবচেতন' ওইভাবে গঠিত হয়। ব্যাপারটা যে তাঁর আবেগে-অনুভবে-ভক্তিতে গভীরভাবে জারিত হয়েছিল তার আরেক প্রমাণ এই যে, তিনি কেবল বাংলা ইসলামি সঙ্গীতের প্রবর্তক ও প্রধান রচয়িতা নন, বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতাও বটে। চর্চার এই ধরনের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে বৃহত্তর বাঙালি-সমাজে কাজী আবদুল ওদুদ-বর্ণিত 'নবসংস্কৃতি'র সূচনা করেছিলেন, যাকে আমরা আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। বস্তুত নজরুলই 'বাঙালী কবিদের ভেতর আধুনিক বাঙালীর প্রথম এবং এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ রূপকার' (মুহম্মদ নূরুল ১৩৯৫ : ৪০)।

কাজী নজরুল ইসলামকে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক হিসাবে ভাবা হয় তাতে একবিন্দু অতিরঞ্জন নাই। সাথে আরো যোগ করা দরকার, এ ব্যাপারে তাঁর সাথে তুলনীয় কোনো ব্যক্তিত্ব বাঙালি সমাজে আগে বা পরে আর কখনোই জন্মাননি।

৩

কিন্তু একে নজরুলের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হিসাবে দেখার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নাই। যুগসত্য হিসাবে দেখলেই কেবল এই দেখাটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। সমকালেই অনেকে তাঁকে অভিহিত করেছিলেন 'যুগমানব' অভিধায়। কথাটার বিশেষ অর্থ এই যে, ওই যুগের গুরুত্বপূর্ণ ভাব-স্বভাব নজরুলের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে অনুভবযোগ্য মূর্তি পেয়েছিল। কী সেই ভাব-স্বভাব? বাঙালির 'জাতীয়' জীবনের দিক থেকে তখন সম্প্রদায়গত মেশামিশির একটা উপলক্ষ তৈরি হয়েছিল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষণস্থায়ী মিলনমেলা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। ব্যক্তি ও সাহিত্যিক নজরুলের মধ্যে এই ভাবের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছিল, এবং হুমায়ুন কবির (২০০২) সঙ্গত কারণেই নজরুলকে অসহযোগ আন্দোলনের কবি হিসাবে অভিহিত করেছেন।

ব্যাপারটা যে প্রধানত ব্যক্তির গুণ নয় তার এক প্রমাণ এই যে, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা বিপুলভাবে দেখা গেলেও বাঙালি হিন্দুর মধ্যে তা দেখা যায়নি। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মেলামেশার ঔদার্য বাঙালি হিন্দুও দেখিয়েছিল, তার প্রমাণ চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মিলনাকাঙ্ক্ষায় সাড়া দেয়ার মতো কোনো সাহিত্যিক প্রতিনিধি বাঙালি হিন্দু সমাজে পাওয়া যায় না।

মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা 'পশ্চাৎপদ' নতুন-উদ্ভূত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল। নজরুল ছাড়াও আরেক কবি জসীমউদ্‌দীন এবং শিখা গোষ্ঠীর তরুণ চিন্তকদের মধ্যে তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য চিরকালের মতো সঞ্চিত হয়ে রইল।

এখানে 'সম্প্রদায়' সম্পর্কে আলাপ তোলা প্রাসঙ্গিক হবে। সম্প্রদায়প্রাণতা বা সম্প্রদায়গততার সাথে সাম্প্রদায়িকতার যে গভীর পার্থক্য আছে, বাঙালি সমাজে – ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কারণেই হয়ত – তা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। নজরুল বা শিখা গোষ্ঠীর তরুণেরা যখন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির জন্য কাজ করছিলেন, তখনো বাঙালি সমাজের প্রধান দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা খুব জোরালো ছিল। বাংলা অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক বয়ানে অবশ্য অন্যায্যভাবে কেবল মুসলমান পক্ষের স্বাতন্ত্র্যবাদের কথা প্রচারিত আছে। কার্যত দুই সমাজের কোথাও সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল ছিল না। তাই রাজনীতির হাওয়া বইতে-না-বইতেই দুই সমাজ দুই জাতির মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে দেরি হয়নি।

নজরুলের কাজের মূল ভিত্তি ছিল মুসলমান সমাজ। শিখা গোষ্ঠীর তরুণেরা তো নিজেদের সংগঠনের নামই দিয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। কথাটা সতর্কতার সাথে পাঠ করা দরকার। মুসলমান সমাজকে বাংলার হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা করে পড়বার এই ধারা মুসলমানদের আবিষ্কার নয়। উনিশ শতকের উপনিবেশিত কলকাতায় এর যাবতীয় এনতেজাম সমাপ্ত হয়েছিল। ওই শতকে বাংলার ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্যে এবং রাজনৈতিক চর্চায় বিভাজিত ভাষা-পরিভাষা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, মুসলমান লেখকদের পক্ষে কোনো সার্বিক সম্বোধন সম্ভবপর ছিল না। তাই শিখা গোষ্ঠীর এতটা 'অসাম্প্রদায়িক', এতটা 'উদারনীতিবাদী', এতটা 'মানবতাবাদী' তরুণগোষ্ঠীকেও সম্প্রদায়গত নাম নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই সম্প্রদায়গত পরিচয় কি এঁদের চর্চায় কোনো সাম্প্রদায়িক টান তৈরি করেছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, তেমন কিছু ঘটেনি – নজরুলের ক্ষেত্রেও না, শিখা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও না। দুই দশক আগের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়া কাজ করেছেন মুসলমান মধ্যবিত্ত নিয়ে। আরো ভালো হয় বললে, তাঁর কাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল উচ্চবিত্ত জমিদারশ্রেণির মুসলমান মেয়েরা, যাদের একটা বড় অংশ আবার অবাঙালি উর্দুভাষী। কিন্তু কাজের এ ধরন তাঁর কাজের সর্বজনীন গুরুত্ব কমায়নি। বস্তুত পুঁজির বিকাশ ও শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠেনি এমন যে কোনো সমাজে জনসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্টতা বেশ উপকারী হয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার তিক্ততার কারণে আমাদের সমাজে এই সহজ ধারণা চাপা পড়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার স্মৃতি, ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়া এবং সেই রাষ্ট্রের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার কারণে এখানে সাধারণত সম্প্রদায়গত যে কোনো প্রকল্পকে

সাম্প্রদায়িকতার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। নজরুল এ ধরনের হীনমন্যতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

তবু, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় অসহযোগ আন্দোলনজনিত জাতীয়তাবাদের কালে নজরুল সম্প্রদায়ের কথাটা গোপন করারই প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাঁর ওইসময়ের রচনাবলি সে সাক্ষ্য দেয়। *যুগবাণী* (১৯২২) গ্রন্থের 'নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।' এ উদ্ধৃতির 'বৌদ্ধ' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান' শব্দ দুটির ব্যবহার আলংকারিক। কারণ সেকালের তৎপরতায় এ দুই পরিচয়ের কোনো কার্যকর ভূমিকা ছিল না। যাদের ছিল সেই হিন্দু আর মুসলমানকে তিনি আহ্বান করেছেন, নিজেদের সম্প্রদায়-পরিচয়কে মুলতুবি রেখে দেশের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে। দুই বাক্য পরেই তিনি সরাসরি দেশের প্রসঙ্গ টেনেছেন: 'আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।' স্পষ্টতই প্রয়োজনটা দেশের। দেশের প্রয়োজনেই সম্প্রীতিপূর্ণ তৎপরতা দরকার। সময়ের সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য নজরুল বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

একই গ্রন্থভুক্ত 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধেও সমধর্মী আহ্বান আছে:

> এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই। ... আমাদের এ-মহামিলন চিরন্তন হোক।

এ উদ্ধৃতির প্রতিটি সুর-তাল-লয় সাক্ষ্য দেয়, 'সহযোগিতাবর্জন আন্দোলন'ই এ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি। সম্প্রদায়গুলোর বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি, তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয়নি। 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'কে যদি দুটি বর্গ বিবেচনা করা যায়, তাহলে বলতেই হবে, নজরুলের এই আহ্বানে সে বর্গ দুটির আভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্যগুলো বড় না হয়ে বড় হয়ে উঠেছে বাইরের একটি বর্গ। সেটা হলো জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ এ কাজ করে। পার্থক্যকে চাপা রেখে মসৃণ ঐক্য তৈরি করতে চায়। কিন্তু তা তো হবার নয়। কৃত্রিম ঐক্য বাস্তব সমস্যাগুলোকে আড়াল করতে চায় বলে সমস্যাগুলো বরং বড় হয়ে ওঠে। ভারতের ইতিহাসে তাই হয়েছিল। পরবর্তী জাতীয়তাবাদী ভাবধারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নয়, বরং বিরোধের পথ ধরেই বিকশিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছিল। সম্প্রদায়-পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে না পারা এবং

পার্থক্যের কারণগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে না পারাই হয়ত ওইকালের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম কারণ। নজরুলের আহ্বান সেই কারণ থেকে মুক্ত নয়।

প্রবন্ধের মতো সৃষ্টিশীল রচনায়ও নজরুল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে বিশ্লেষণমূলক বর্গে না দেখে শুভকামনামূলক বর্গে দেখেছেন। এখানে নজরুলের বিখ্যাত গান থেকে বহুল-উদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করছি :

> অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
> কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
> 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
> কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার! ('কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!', *সর্বহারা*)

এ গানের শৈল্পিক-প্রায়োগিক তাৎপর্য অসামান্য। যে কোনো ভাষাতেই এ ধরনের সৃষ্টি বিরল ঘটনা। কিন্তু মানুষের সংকট চিহ্নিতকরণে এবং সে সংকটের সুরাহা নির্দেশের ক্ষেত্রে গানটিতে অযাচিত সারল্য আছে। ধরে নেয়া হয়েছে যে, হিন্দু বা মুসলমান পরিচয় মুলতুবি রাখতে পারলেই 'মানুষ' পরিচয়টি বড় হয়ে উঠবে এবং সামষ্টিক মুক্তির পথে আর বাধা থাকবে না। যে পরিস্থিতিতে এ ধরনের উচ্চারণ সম্ভবপর হয়েছিল, তার কথা মনে রাখলে একে অন্যায্য মনে হবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মতো একটা অত্যন্ত জটিল বর্গের মীমাংসার জন্য এটি অতিরিক্ত নিরীহ আর সরল পদ্ধতি। নজরুল এবং তাঁর সমসাময়িকদের অবলম্বিত এ সরল পদ্ধতি আমাদের সামাজিক ভাষায় আজও প্রবলভাবে উপস্থিত। তাই এর পুনর্মূল্যায়ন জরুরি।

৪

সাম্প্রদায়িকতার ধারণা মোটেই সরল ধারণা নয়। দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অভিধানগুলো সাম্প্রদায়িকতা বা 'কমিউনালিজম'কে একেবারেই ভিন্নভাবে চিহ্নিত করে থাকে। সাধারণভাবে অভিধানে 'কমিউনালিজম' কথাটার তিনটি অর্থ চিহ্নিত করা হয়: ক) কমিউনালিজম এক সরকার-ব্যবস্থা, যেখানে জাতি কাজ করে একটা শিথিল ফেডারেশনের মতো, এবং সম্প্রদায়গুলো প্রায় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়; খ) সম্প্রদায়গত মালিকানা-পদ্ধতি; গ) বৃহত্তর সমাজের বদলে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সাথে সার্বিক একাত্মতার বোধ। ভারতীয় অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে অবশ্য সম্প্রদায়ের ভাগাভাগিটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা এখানে এত প্রবল যে, সাম্প্রদায়িকতার অন্য প্রেক্ষাপট ও অর্থগুলো এখানে মোটেই সামনে আসেনি। ভারতীয় অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে আমরা সাম্প্রদায়িকতার তিন ধাপ

বা ধরন এভাবে চিহ্নিত করতে পারি: ক) ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লোকজনের স্বার্থ নির্ধারিত হয়; খ) অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে এই স্বার্থের পার্থক্য আছে; গ) এই পার্থক্য অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতি, ঘৃণা এবং বিরোধের জন্ম দেয়। বিপান চন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থপরিসরে সাম্প্রদায়িকতার সমরূপ স্তর নির্ধারণ করেছেন (Chandra 1984: 1)।

উল্লিখিত তৃতীয় ধাপের পরিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সমসাময়িকরা দাঙ্গার তীব্রতা প্রত্যক্ষ করেছেন। দাঙ্গা যে ভাসমান হিমশৈলের প্রকাশিত চূড়ার মতো সামগ্রিক বাস্তবতার ছোট একাংশ মাত্র, তা বোঝার সুযোগ তাঁদের হয়নি। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল জাতীয়তাবাদী ঐক্য, অথচ বাস্তবে ঘটছিল দাঙ্গার পর দাঙ্গা। পরিস্থিতির তীব্রতা এবং আশাভঙ্গের বেদনা তাঁদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, দাঙ্গাকারীরাই দাঙ্গার কারণ এবং প্রকাশিত বাস্তবতাই চূড়ান্ত বাস্তবতা। নজরুল-রচনা থেকে ব্যাপারটা পরীক্ষা করা যাক।

যুগবাণী গ্রন্থের 'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন:

> আমরা বলি কি, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর করো দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সে-স্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, – মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা! ... অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, 'ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই!' কী ভীষণ প্রতারণা!

আপাতদৃষ্টিতে এ প্রবন্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি ঠিকই আছে। হিন্দু ধর্মতত্ত্ব এবং আচারব্যবস্থার আলোচনায় একে গুরুত্ব দিয়েই বিচার করা উচিত। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আলোচনায় বিশেষত মুসলমানের সাথে হিন্দুর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ছুঁৎমার্গের বিষয়টা সামনে নিয়ে আসা বিভ্রান্তিকর। এ আলাপটা মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তখন উঠেছিল। কিন্তু বোঝা দরকার, সম্প্রদায়গত অন্য বিরোধ এবং অবিশ্বাসের প্রেক্ষাপটেই এ আপত্তিটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ, হিন্দু আচারব্যবস্থায় যদি ছুঁৎমার্গের ব্যাপারটা থেকেই থাকে তাহলে সে উপাদানসহই হিন্দুদের সম্প্রদায়গত পরিচয় নির্ধারিত হওয়ার কথা। সে উপাদানসহই হিন্দুদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কথা। চিরকাল তা-ই হয়ে আসছে। তারচেয়ে বড় কথা, এই ছুঁৎমার্গের বিষয়টা কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং এমনকি হিন্দু-ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই সাম্প্রদায়িকতার অন্য গভীরতর কারণগুলো খতিয়ে না দেখে

ছুঁৎমার্গের মতো লক্ষণকে বড় করে তোলা এক বর্গীয় গোলমাল। এটা পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে না, জাতীয়তাবাদী আলংকারিকতা তৈরি করে মাত্র। ওইসময় জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার চাপে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যাখ্যা করার এই ধরন বেশ জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে তার প্রমাণ মিলবে।

কালান্তর গ্রন্থের বিখ্যাত 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র – সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান-ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। ... হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। ... আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে।

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়ার কারণ, এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বোঝার জন্য অংশটি বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ অংশে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে বাংলাদেশে সে দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রদায়িকতাকে দেখার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। অথচ দৃষ্টিভঙ্গিটি ঘোরতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এখানে জনগোষ্ঠীর সাথে ধর্মমতের স্থিরনির্দিষ্ট সম্পর্ক কল্পনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বিবর্তন, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং অপরাপর নির্ণায়ক উপাদানগুলো থেকে বিযুক্ত রেখে 'ধর্মে'র স্বাধীন সত্তা প্রস্তাব করা হয়েছে। এমনকি উৎপাদনসম্পর্ক, শ্রেণিসম্পর্ক এবং ক্ষমতাসম্পর্কের মতো বর্গীকরণের জন্য প্রভাবশালী প্রভাবকগুলোকেও আমলে আনা হয়নি। আরো আছে। এ বিবরণীতে ধর্মকে ভাবা হয়েছে সমরূপ উপাদান, স্থান-কাল-শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে যা একই রকম আচরণ করে। ইংরেজিতে যাকে এসেন্সিয়ালিজম [সারবাদী] বলা হয়, এ ধরনের বিবেচনাপদ্ধতি তার মধ্যেই পড়ে। এর বিপরীতে সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতার মতো ব্যাপারকে বোঝা দরকার কাঠামোবাদী পদ্ধতিতে। কারণ, সমস্যাটা কাঠামোর, এবং

কেবল কাঠামোগত পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই কোনো বিশেষ দেশ-কালের সাম্প্রদায়িক সমস্যার বোঝাপড়া হতে পারে।

'হিন্দু' এবং 'মুসলমান' বর্গের নিরিখে এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতা বোঝার এ পদ্ধতি – রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের উদাহরণ দিয়ে উপরে যা বলা হল – নিঃসন্দেহে তা জাতীয়তাবাদজনিত বর্গীকরণের সমস্যা। কাছাকাছি সময়ে অন্য প্রেক্ষাপটে লেখা প্রবন্ধগুলোতেও নজরুল একই পদ্ধতি এবং বর্গ ব্যবহার করেছেন। *নজরুল-রচনাবলী*র প্রথম সম্পাদক আবদুল কাদির জানাচ্ছেন (কাজী নজরুল ২০০৭: ৪৫৫):

> ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল মুতাবিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯শে চৈত্র শুক্রবার কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই উপলক্ষে নজরুল ইসলাম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট মুতাবিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র তারিখের 'গণবাণী'তে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং ২রা সেপ্টেম্বর মুতাবিক ১৬ই ভাদ্র তারিখের 'গণবাণী'তে 'হিন্দু-মুসলমান' লেখেন।

দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা এই প্রবন্ধ দুটির মানবিক আর্তি অসাধারণ। সেই দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ কালে এর আবেদন নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধ দুটোও আমাদের সামনে সাম্প্রদায়িকতা বা দাঙ্গা সম্পর্কে কোনো কাঠামোগত বিশ্লেষণ উপস্থিত করে না – সারবাদী সিদ্ধান্ত হাজির করে মাত্র। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে তিনি মসজিদ-মন্দিরের কল্যাণমূর্তি দেখেছেন এভাবে: 'আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে – স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।' এর বিপরীতে তিনি ওই মন্দির-মসজিদকে বাতিল করেছেন, যেগুলো মানুষের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ইট-সুরকি-নির্মিত জড়ের মতো নিরুত্তর থাকে। একইভাবে নজরুল ধর্মের মধ্যে সত্যের আলো দেখেছেন, আবার শাস্ত্রের গোঁড়ামি দেখেছেন। তাঁর মতে, দাঙ্গা বাঁধায় শাস্ত্রওয়ালারা, যাদের নেতা 'শয়তান'। দাঙ্গাকারীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এল্‌কোহল পান করিয়াছে।' সাম্প্রদায়িকতা ব্যাখ্যার জন্য নজরুল একই ধরনের সরল কায়দা ব্যবহার করেছেন 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধেও। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত তাঁর বিখ্যাত মন্তব্যটি স্মরণ করা যাক:

> হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়।

ধার্মিক থেকে সাম্প্রদায়িককে আলাদা করে দেখা এবং দাঙ্গার দায়ভার ধর্মীয় নেতাদের ওপর চাপানো বাংলা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা ব্যাখ্যার পদ্ধতি হিসাবে অদ্যাবধি বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু পদ্ধতিটি কেবল অনৈতিহাসিক নয়, এটি গুরুতর সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট। দাঙ্গার সৃষ্টিশীল বা গবেষণাধর্মী গুরুত্বপূর্ণ ন্যারেটিভে কখনোই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি যে, দাঙ্গার মতো কর্মকাণ্ড ধর্মীয় নেতাদের পরিচালনায় সংঘটিত হয়, কিংবা এ-ও দেখা যায়নি যে, দাঙ্গা বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের কাজ। বস্তুত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয় মোটেই, অনেক বেশি সামষ্টিক এবং পরিস্থিতিগত। নজরুলের বিচার-বিশ্লেষণে এই সামষ্টিকতা এবং পরিস্থিতি-বিবরণী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নজরুল যে দাড়ি এবং টিকিকে দাঙ্গার প্রতীক ধরেছেন, এবং সমধর্মী বিবেচনা যে অদ্যাবধি বেশ প্রবল, তার পেছনে অন্য একটা ধারণাও কাজ করে থাকে। ধরে নেয়া হয়, তুলনামূলক 'অশিক্ষিত', 'পশ্চাৎপদ' এবং 'অনাধুনিক' অংশই সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকে এবং দাঙ্গা বাঁধায়। এই জনপ্রিয় চিন্তারও ঐতিহাসিক স্বীকৃতি মেলে না। বিশ্বব্যাপী গত কয়েকশ বছরের দাঙ্গার ইতিহাস মুখ্যত নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস। অন্যদিকে সারা দুনিয়ার 'আধুনিকায়নে'র সাথে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সম্পর্কও বিপুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। নাইজেরিয়ার বাস্তবতায় গবেষকরা দেখিয়েছেন (Melson and Wolpe 1970 : 1113) : 'An analysis of the Nigerian case suggests, rather, that modernization, far from destroying communalism, in time both reinforces communal conflict and creates the conditions for the formation of entirely new communal groups.' ভারতবর্ষের এবং বিশেষত বাংলা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা মোটেই ভিন্ন নয়।

বাংলা অঞ্চলে সাধারণত ইংরেজশাসন ও 'আধুনিকতা'কে একাকার করে দেখা হয়। ভাবা হয়, পশ্চিমা আদর্শ ও মূল্যবোধ সঞ্চারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের মূল্যবোধ ও জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। সাম্প্রতিক নতুন ধারার ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, ভারতের পশ্চিমায়ন আর আধুনিকায়ন তো দূরের কথা, উনিশ শতকে ব্রিটিশরা বরং কৃষক ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের এক ঐতিহ্যিক ভারত আবিষ্কার করে, এবং তাকেই রূপায়িত করে (Bose and Jalal 2002 : 77)। আঠার শতকে গ্রামীণ সমাজে যে চলিষ্ণুতা ছিল, তার বিপরীতে ঔপনিবেশিক শাসন তৈরি করে সুবিধাজনক স্থিতিশীল গ্রামসমাজ। সামাজিক স্থিতিশীলতার অংশ হিসাবে ব্রিটিশ প্রশাসন সমাজের বর্ণবিভাজনকে শক্তিশালী করে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের নিশ্চয়তা তৈরি করে, যা তাত্ত্বিকভাবে উপনিবেশপূর্ব যুগে থাকলেও বাস্তবে প্রায়শই উপেক্ষিত হতো (Bose and Jalal 2002 : 77)। মোটেই অস্বাভাবিক নয়, উপনিবেশিত বাংলার সমাজে ও রাজনীতিতে ধর্মীয় 'রক্ষণশীলতা'র দীর্ঘমেয়াদি প্রতাপ দেখা গেছে, এবং এই ধারার প্রচারক ও অনুসারীরা প্রায় সকলেই পশ্চিমা-শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ফলে

'আধুনিকতা' বা 'শিক্ষা'র সাথে মিলিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার সরল সুযোগ নেই।

নজরুলের সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতা-সম্পর্কিত রচনাগুলোতে যে কাঠামোগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না, সেটা অস্বাভাবিক নয়। পীড়াদায়ক এই যে, এগুলোতে ঐতিহাসিক সচেতনতারও পরিচয় নাই। অথচ ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী কবি হিসাবে ইংরেজদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির তিনি জোরালো সমালোচক। তাঁর অন্য রচনায় এ ধারণার ব্যবহার আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ব্যাখ্যার জন্য তিনি ইংরেজ শাসনের সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ করেননি।

৫

নজরুলের রচনায় এবং ওইকালের অন্য বাঙালি লেখকদের রচনায় সাম্প্রদায়িকতার কেবল একটি মাত্রার আলোচনা আছে – হিন্দু-মুসলমানকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আরো বিস্তর ধরন আছে, যেহেতু সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয়ের ধর্ম ছাড়াও আরো বিচিত্র উপাদান আছে। শ্রেণিও আচরণ করতে পারে সম্প্রদায়ের মতো এবং শ্রেণি-পরিচয়ও হয়ে উঠতে পারে সাম্প্রদায়িক, কারণ শ্রেণিপরিচয়ের ভিত্তিতে অপরকে বঞ্চিত করা খুবই সম্ভব। নজরুলের রচনায় অবশ্য এ বাস্তবতার জোরালো পরিচয় আছে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বিখ্যাত 'কামাল পাশা' কবিতায় সৈনিকদের মৃত্যুতে ভদ্রলোকশ্রেণির প্রতিক্রিয়ার পরিচয় নজরুল লিখেছেন এভাবে:

তাই যত আজ লিখ্‌েন-ওয়ালা তোদের মরণ ফুর্তি-সে জোর লেখে!
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,

আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে'! ('কামাল পাশা', *অগ্নি-বীণা*)

স্পষ্টতই নজরুল এখানে মেঠো সৈনিকদের বিবেচনা করেছেন শ্রমিকশ্রেণির মানুষ হিসাবে। তাদের প্রতি ভদ্রলোক-সম্প্রদায়ের আচরণে আবিষ্কার করেছেন সাম্প্রদায়িকতা। বহু সৈনিকের মৃত্যুকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া বা দিতে না পারা বৈষম্যই বটে। এ বৈষম্যের পরিচয় নজরুল-সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আছে।

কিন্তু নাই অন্য অনেক কিছু। ভারতবর্ষে সাধারণভাবে ধর্মকেই সাম্প্রদায়িকতার উপাদান ভাবা হলেও কার্যত আরো বহুরকমের সাম্প্রদায়িকতা চলছে। বলা যায়, কোনো দুটি গোষ্ঠী যদি ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল, শ্রেণি, বর্ণ ইত্যাদির যে কোনো একটি বা একাধিক উপাদানের ভিত্তিতে ভিন্ন হয়, সে ভিন্নতা যদি উৎপাদন-সম্পর্ক ও

ক্ষমতাসম্পর্ককে প্রভাবিত করে, এবং তার ভিত্তিতে যদি একে অন্যকে কোনো অধিকার বা মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলতে হবে। ভারতবর্ষ যেমন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি ভাষিক, আঞ্চলিক বা জাতিগত স্বাতন্ত্র্যেও বহুবিচিত্র। এর প্রতিটি ধারায় রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিপীড়ন নিত্য বাস্তবতা। কিন্তু নজরুলসহ সেকালের ভাবুকরা এসব বিচিত্র সাম্প্রদায়িকতায় নজর দেবার অবসর পাননি।

৬

বাংলাদেশের সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের চেয়ে আলাদা নয়। এখানেও বিচিত্র ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-গোত্রের মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থগত টানাপড়েন আছে, এবং সেই টানাপড়েন অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রূপ নেয়। তার মানে এই নয় যে, বাংলাদেশের মানুষ অন্যদের তুলনায় অধিকতর সাম্প্রদায়িক। ধরা যাক, ইউরোপীয় সমাজের সেমেটিক-জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণবাদ বা ক্যাথলিক-প্রটাস্টান্ট বিরোধের তুলনায় বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বেশি জটিল নয়। তবে ঐতিহাসিক কারণে এবং বর্তমান জনমিতির বাস্তবতায় এখানকার সম্প্রদায়চেতনা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ মূর্তি আছে। একটা প্রভাবশালী বাস্তবতা তৈরি করেছে বাঙালি জনগোষ্ঠীর হিন্দু-মুসলমান জনমিতি।

বাংলা অঞ্চল এদিক থেকে প্রায় অনন্য যে, এখানে বাংলাভাষী জনগণ দুটি প্রায় সমান ধর্মাবলম্বীতে বিভক্ত। সম্ভবত লেবানন ছাড়া এ ধরনের উদাহরণ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৮৭২ সালের জনগণনায় প্রথম এ সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল যে, 'পশ্চাৎপদ' মুসলমান জনগোষ্ঠী বাঙালির মোট সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে বেশি। এ তথ্য 'অগ্রসর' হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কে বড় প্রভাবক হিসাবে আবির্ভূত হয়। আরো পরে ভোটের রাজনীতি শুরু হলে স্বভাবতই উৎপাদন ও ক্ষমতা-সম্পর্কিত স্বার্থ ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হতে থাকে। বাংলা অঞ্চলের পরবর্তীকালীন দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি এবং সাতচল্লিশের দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গকে এ নিরিখেই বিচার করা দরকার। বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা আর আগের মতো নেই। এখানকার সাম্প্রদায়িক-পরিস্থিতির সাথেও পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অন্তত দুই দিক থেকে ওই পুরোনো ইতিহাস বর্তমান বাস্তবতায়ও খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। এক. সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতার ফারাক সম্পর্কে এখানে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অভাব আছে। বিপুল দাঙ্গার ইতিহাস আর সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাই সম্ভবত এর প্রধান কারণ। অথচ বিপুল দরিদ্র মানুষের এই দেশে সম্প্রদায়গত বিভিন্ন প্রকল্প জনকল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা। এ ধরনের প্রকল্প ও

কর্মকাণ্ড আসলে চলছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় তার কোনো স্বীকৃতি নাই। না থাকাটা খুব কাজের হয়নি। দুই. পুরোনো অভিজ্ঞতা ও পরিভাষার চাপে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাই আজতক আমাদের মনোযোগ আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ, বাংলাদেশ জাতিতাত্ত্বিক বা ভাষিক সাম্প্রদায়িকতারও উর্বর ক্ষেত্র।

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপড়েন আছে। তবে, সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানের সাথে অন্যদের সম্পর্কের ধরনই এখানকার প্রধান সম্প্রদায়-সংকট। সামাজিক সংকটের তুলনায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিষ্পন্ন সম্প্রদায়-সংকট এখানে অনেক বেশি তীব্র। বড় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে সম্প্রদায়-সংকটের প্রধান নিয়ামক ভোটের রাজনীতি এবং সম্পত্তির মালিকানা। অন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিপীড়নও আছে। এরমধ্যে ঐতিহাসিক দিকের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন চলেছে সম্প্রদায়-নিপীড়ন – জাতিগত নৃগোষ্ঠী এবং ভাষিক নৃগোষ্ঠী এই নিপীড়নের শিকার। আরেকটি দিক থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিপীড়ক ভূমিকা পালন করছে – নিম্নশ্রেণির খেটে-খাওয়া মানুষকে রাষ্ট্র তার প্রকল্পের আওতায় আনতে পারছে না। মুশকিল হলো, এসব সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার কোনোটিকেই বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ কার্যকরভাবে সামনে আনতে পারেনি। প্রচার-প্রপাগান্ডা হয়েছে, কিন্তু পর্যালোচনামূলক সন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমাদের সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা-পরিস্থিতির সেটা আরো গুরুতর সংকট।

৭

সম্প্রদায়-সংকট এবং সাম্প্রদায়িকতা পাঠ – এ দুটো এক নয়। দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশ বিশেষভাবে গরিব। ভারতীয় বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা-পাঠে গালগল্প ও মিথের প্রাবল্য থাকলেও সেখানে পর্যালোচনামূলক সন্দর্ভ যথেষ্ট রচিত হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সারা ভারতের অগ্রগতি বিস্ময়কর। সেখানে রচিত হয়েছে বিপুল পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভ। এতটাই যে, সারা দুনিয়ার সম্প্রদায়-সমস্যা পাঠের ক্ষেত্রে ভারতের অ্যাকাডেমি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। সম্প্রদায়-প্রশ্নে ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা খুবই জোরালো, এবং সিভিল সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতাও উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ভারতে সম্প্রদায়-সংকটের সুরাহা হয়তো হয়নি, কিন্তু বিপন্ন সম্প্রদায়ের সাথে রাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা বেড়েছে, সম্প্রদায়-সংকটে পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিমাণ বেড়েছে। সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে এগুলো নিশ্চয়ই ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা-পাঠের কোনো ধারা আসলে গড়ে ওঠেনি। নজরুল-রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে পাঠের যে রীতি-প্রকৃতির পরিচয় উপরে দেয়া হয়েছে, সে ধারাই এখানে রাজত্ব করছে। এ ধারা নীতিশিক্ষামূলক, আরোপণমূলক এবং সংশ্লিষ্ট

বর্গগুলো সম্পর্কে এসেন্সিয়ালিস্ট বা সারবাদী সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। এর বিপরীতে দরকার সমাজতত্ত্বমূলক, মনস্তত্ত্বমূলক, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক হিসাবে নজরুল নিশ্চয়ই অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস হবেন। সম্প্রদায়-প্রশ্নে তাঁর তৎপরতাও আমাদের জন্য হয়ত অনুসরণীয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা-পাঠের ক্ষেত্রে নজরুলের এবং তাঁর কালের সীমাবদ্ধতা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা যাবে ততই মঙ্গল। স্থান-কালের বাস্তবতায়, তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিরামহীনভাবে কাঠামোগত বিচার-বিশ্লেষণই আমাদের সম্প্রদায়-সংকটকে ভিতর থেকে নির্মূলের পথ দেখাতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ ছফা (২০০২)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আহমদ শরীফ (১৩৭৯)। 'নজরুল ইসলামের ধর্ম', *নজরুল সমীক্ষণ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৭)। *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গৌতম ভদ্র (২০১১)। *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?*, ছাতিম বুক্‌স্, কলকাতা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৩৯৫)। 'বিবর্তিত বাঙালী ও নজরুল ইসলাম', *রবীন্দ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মুক্তধারা, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৩৭৯)। 'নজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', *নজরুল সমীক্ষণ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)। 'বটতলার 'দোভাষী' সাহিত্য – সেকাল ও একাল', *অনুষ্টুপ*, সম্পাদক: অনিল আচার্য, বটতলা বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা

হুমায়ুন কবির (২০০২)। *বাংলার কাব্য*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

Bose, Sugata and Jalal, Ayesha (2002), *Modern South Asia : History,Culture, Political Economy*, 4th impression, Oxford University Press, New Delhi

Chandra, Bipan (1984), *Communalism in Modern India*, Vikas Publishing House, Delhi

Chakrabarty, Dipesh (2002), 'Memories of Displacement: The Poetry and Prejudice of Dwelling', in*Habitations of Modernity : Essays in the Wake of Subaltern Studies*, The University of Chicago Press, Chicago

Kaviraj, Sudipta (2003), 'The Two Histories of Literary Culture in Bengal', in *Literary Culturesin History :Reconstructions from South Asia*,

Edited by Sheldon Pollock, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London

Melson, Robert and Wolpe, Howard (1970), 'Modernization and the politics of communalism: A theoretical perspective', *The American Political Science Review*, Vol. 64, No. 4